দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 AUG 1986 ... পৃষ্ঠা ...

ঢাকা : শনিবার, ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৯৩

054

পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্ট

সরকার গঠিত পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। কমিটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির গলদগুলি চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে ১১-দফা সুপারিশ পেশ করেছে।

আমাদের দেশে পরীক্ষা, বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান ব্যর্থতা ও এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা কম-বেশী অবহিত। পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি সে সম্পর্কে অনেকেরই পরিষ্কার ধারণা নেই। পরীক্ষার ধরন এবং পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। প্রশ্ন রয়েছে উত্তরপত্র মূল্যায়ন সম্পর্কে। ফল প্রকাশে বিলম্ব হয় এখানে অত্যধিক। ফলাফল নির্ধারণের মাপকাঠি নিয়েও কথা রয়েছে। বিতর্ক আছে সেমিষ্টার পদ্ধতি চালু করার প্রশ্নে। পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ অনেক জায়গাতেই অনুপস্থিত। শ্রেণী কক্ষের পাঠদানও মোটেই সন্তোষজনক নয়। বিতর্ক আছে পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে। পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়নের জন্য গবেষণা এখানে হয় না বললেই চলে। কমিটি পরীক্ষা সংক্রান্ত ওইসব বিষয়ে তাদের সুপারিশ রেখেছে।

কমিটি আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান এবং যুক্তরাজ্যের মত উন্নত দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলংকার পরীক্ষা ব্যবস্থার সাথে আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার তুলনা করে দেখিয়েছে। মাত্র সাত মাস সময়ের মধ্যে কমিটি এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত সুপারিশমালা পেশ করে নিঃসন্দেহে বড় কাজ করেছে। কিন্তু অতীতেও শিক্ষা সংক্রান্ত বহু কমিটি গঠিত হয়েছে। তারা মূল্যবান সুপারিশ পেশ করেছেন; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঐসব কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়নি। হামুদুর রহমান কমিশনের গণবিরোধী রিপোর্টের মত রিপোর্ট বাস্তবায়নের কথা আমরা বলি না। কিন্তু কুদরতে খুদা কমিশনের মত যেসব রিপোর্ট ছিল জনকল্যাণকামী, এদেশে শিক্ষা প্রসারের অনুকূল সেগুলোরও যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি। আমরা আশা করব পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্ট সে ভাগ্য বরণ করবে না।

শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে পরীক্ষা কার্যক্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষার পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হলো কিনা পরীক্ষার মাধ্যমে তা যাচাই করা হয়। শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার, জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা বাস্তবমুখী ও মানবিক জীবন দর্শন গড়ে তোলা। পরীক্ষায় এর মূল্যায়ন হয়। পরীক্ষার উন্নয়ন কমিটি এ প্রসঙ্গে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যে মূল্যায়ন করেছেন তাতে এ ক্ষেত্রে আমাদের গলদ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

কমিটি সোভিয়েত ইউনিয়নে পরীক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে বলেছেন সেখানে পরীক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্বশীল মনোভাব গড়ে তোলা। যুক্তরাষ্ট্রে পরীক্ষাকে একটি লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ বলে মনে হয়। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে শুধু উচ্চ নম্বর পাওয়াকে পরীক্ষার লক্ষ্য বলে মনে করা হয় না। আমাদের দেশে অবস্থাটা ভিন্ন। এর কারণও রয়েছে। এ দেশে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়াপত্তন বৃটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্টে যথার্থই উল্লেখ করা হয়েছে তাদের লক্ষ্য ছিল এদেশে এমন একটি শ্রেণী তৈরী করা "যারা রক্তে ও রংয়ে হবেন ভারতীয় এবং রুচি, মতামত, নৈতিকতা ও বুদ্ধিমত্তায় ইংরেজ।" ঐ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের সাহায্যার্থে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে উপযুক্ত কর্মচারী সৃষ্টি করা। কর্মচারী সৃষ্টিই এখনো আমাদের শিক্ষা কার্যক্রমের প্রধানতম উদ্দেশ্য থাকায় অন্যান্য মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।

পরীক্ষার ধরন অর্থাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে হবে, না স্থানীয়ভাবে হবে (প্রশ্ন তৈরী, পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ, গ্রেডদান) এই নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। জাপানে স্কুল স্তরে কোথাও বহিঃপরীক্ষা নেই। যুক্তরাষ্ট্রেও একটি অঙ্গরাজ্য ছাড়া কোথাও বহিঃপরীক্ষা নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নে পরীক্ষা পরিচালনা প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট স্কুল শিক্ষকদের দায়িত্ব। কিন্তু এই উপমহাদেশে বৃটিশদের অনুকরণে বহিঃপরীক্ষা চালু রয়েছে। আমাদের দেশে অন্তঃপরীক্ষা প্রবর্তনের প্রধান প্রধান বাধা হচ্ছে বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে মানগত পার্থক্য, শিক্ষকদের নিরপেক্ষতার প্রশ্ন, স্থানীয় প্রভাবশালী লোকের সম্ভাব্য চাপ প্রয়োগ ইত্যাদি। তবে ছাত্ররা যেহেতু একটি নির্দিষ্ট স্কুলে পড়াশোনা করে সেজন্য সেই স্কুলের শিক্ষকরা তাদের সম্পর্কে সবচেয়ে ভাল জানেন। বহিঃপরীক্ষায় কোন কারণে কোন ছাত্র খারাপ করলে তার সারা বছরের ভাল পড়াশোনা বরবাদ হয়ে যায়। তবে দেশের বর্তমান বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বহিঃপরীক্ষার ওপর শতকরা ৮০ ভাগ এবং অন্তঃপরীক্ষার ওপর শতকরা ২০ ভাগ নম্বর রাখার প্রস্তাবটি যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। অন্তঃপরীক্ষার মূল্যায়ন যাতে নিরপেক্ষ হয় সে জন্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বার বার পুনরাবৃত্তি হয় এমন ধরনের রচনাধর্মী প্রশ্নে না বুঝেও মুখস্থ বিদ্যায় পরীক্ষা পাস করা যায়। তাই নৈর্ব্যক্তিক (অবজেকটিভ) এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের ওপরও যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রত্যেক বছরই আমাদের দেশে উত্তরপত্রের মূল্যায়ন নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ওপর গুরুত্ব যত বেশী দেয়া হবে এক্ষেত্রে বিতর্ক তত কমবে। রচনাধর্মী উত্তরপত্র মূল্যায়নে পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। উত্তরপত্র কেন্দ্রীয়ভাবে মূল্যায়নের ব্যবস্থা কদ্দুর বাস্তবসম্মত যে প্রশ্ন ওঠবে। বিশ্ববিদ্যালয়েই যেখানে এখন পর্যন্ত সিমেষ্টার পদ্ধতি কার্যকরভাবে চালু করা যায়নি, সেখানে মাধ্যমিক পর্যায়ে তা চালু করা অসম্ভব বলেই মনে হয়। বিশেষ করে যেখানে স্কুলগুলোর লেখাপড়ার মানে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে সেখানে এটা আরো দুরূহ।

আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রধান কারণ হচ্ছে পরীক্ষার্থীদের নকল করে পরীক্ষাদান। নকল এত ব্যাপক হচ্ছে যে, ইতিমধ্যে তা গণটোকাটুকির আখ্যা পেয়েছে। পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি ১০টি প্রতিনিধি সম্মেলনে মিলিত হয়ে এ ব্যাপারে যে-সব প্রধান কারণ সম্পর্কে একমত হন সেগুলো হচ্ছে :- (১) রাজনৈতিক অস্থিরতা, (২) সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, (৩) বিপর্যস্ত অর্থনীতি, (৪) শ্রেণী কক্ষে নিম্নমানের শিক্ষাদান, (৫) শিক্ষক সমাজে সততার অভাব, (৬) যত্র-তত্র পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, (৭) পাসের সম্ভাবনাহীন ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা দেয়ার অনুমতিদান, (৮) ব্যাপক প্রাইভেট কোচিং এবং (৯) স্থানীয় প্রশাসনের ঔদাসীন্য বা শৈথিল্য। কাজেই নকল বন্ধ করতে হলে এসব দিকে নজর দিতে হবে।

শুধু পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের ফলেই সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে মনে করলে অযৌক্তিক আশা করা হবে। মূল সমস্যা শিক্ষার মান উন্নয়নের। বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের উন্নতি ছাড়া শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্যে চাই বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও সকল বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব সমতা আনয়ন। এর পাশাপাশি দরকার উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে আকর্ষণীয় করে তোলা ও শিক্ষকদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়ার ব্যবস্থা। শিক্ষার বিষয়বস্তুও হওয়া উচিত যুগোপযোগী। পরীক্ষা পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে নকলের সুযোগ কমে। তবে নকল বন্ধ করতে হলে নয়া পদ্ধতি উদ্ভাবনের পাশাপাশি চাই ছাত্র-শিক্ষক-পরীক্ষক-অভিভাবক-পরীক্ষাগ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ তথা সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। পদ্ধতি যাই হোক তার প্রয়োগকারীরা যদি নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত না হন, ছাত্র ও অভিভাবকরাই যদি নকলের মোহ কাটিয়ে ওঠতে না পারেন তাহলে সকল বজ্র আঁটুনিই ফস্কা গেরোতে পরিণত হতে বাধ্য।